ইসলামিক
সোশ্যাল ফাইন্যান্স

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স
(আইআইএসএফ)

ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স
(আইআইএসএফ)
১১৩/বি (৩য় তলা), তেজগাঁও শিল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ

মোবাইল : +৮৮০ ১৯১৮ ৪০৩০১২
ফোন : +৮৮০ ৯৬১১ ৬৮৮ ০০২
info@iisf-bd.org
facebook.com/IISFBD
www.iisf-bd.org

১ম সংস্করণ : জুন, ২০২৫

মূল্য : ২০/- (বিশ টাকা)

Islamic Social Finance
Published by Institute Islamic Social Finance (IISF)

ইসলামি সামাজিক অর্থায়ন

সমাজের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো সম্পদ (wealth)। সম্পদ মানুষের ব্যবহারে আসার কারণে সমাজের মধ্যে মানুষের আচরণ ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। সম্পদ বা সম্পত্তি আবিষ্কার বা সৃজন, আহরণ, ব্যবহার ও বিলিবন্টনের সুনির্দিষ্ট নীতি-পদ্ধতি বিকাশলাভ করে। কোনো সম্পত্তিই সাধারণভাবে কারো কাছে কুক্ষিগত অবস্থায় চিরন্তনভাবে থাকতে পারে না। সমাজে মানুষের বিত্তবৈষম্যও একটি মানবীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে উদ্ভুত হয়। এই মানবীয় সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখে ইসলাম সম্পত্তির কাঙ্খিত হস্তান্তরের বিষয়ে স্পষ্ট বিধিবিধানের নির্দেশনা দিয়েছে।

পবিত্র কোরআনে পার্থিব সম্পদকে আশীর্বাদ ও পরীক্ষা- এই উভয় অর্থেই বিবেচনা করা হয়। সম্পদ আয়ত্তকরণের মানবীয় প্রবৃত্তিকে অস্বীকার না করে ইসলাম বিধিসম্মতভাবে উপার্জন, অন্যের সম্পত্তির অধিকারকে সম্মান প্রদর্শন এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তের জন্য সম্পদ ব্যয়কে উৎসাহিত করে। শেষ বিচারের দিনে প্রত্যেক মুসলিমকে তার সম্পদ অর্জনের উপায় ও উৎস এবং কীভাবে ও কোথায় তার সম্পদ ব্যয়িত হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করা হবে।

ইসলামে সঞ্চয়কে নিরূৎসাহিত করা হয়নি; তবে কৃপণতা ও অপচয়ের বিপক্ষে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। মুমিনের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে যাকাত আদায় এবং আল্লাহর পথে ব্যয় সম্বন্ধে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সমাজে সম্প্রীতি ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য যাকাত ও অন্যান্য শরিয়াহভিত্তিক সম্পদ হস্তান্তর পদ্ধতি অত্যন্ত সুফলপ্রদ ভূমিকা পালন করে।

ধনবানের নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তরের বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়া বা উপায় রয়েছে। এসবের কোনো-কোনোটি মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ ইবাদত। অন্যগুলির মধ্যেও অবশ্য পালনীয়তার কিছু কিছু উপাদান যেমন রয়েছে, তেমনি আছে বিশ্বপ্রতিপালক ও তার প্রিয় রাসূল সা.-এর উৎসাহ ও তাগিদ। সম্পদ হস্তান্তরের এরূপ দাতব্য প্রক্রিয়া বা উপায়সমূহকে সমষ্টিগতভাবে ইসলামি সামাজিক অর্থায়ন (ইসলামিক স্যোশাল ফাইন্যান্স) নামে অভিহিত করা যায়।

ইসলামিক স্যোশাল ফাইন্যান্স হিসেবে পরিগণিত সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বা উপায়সমূহ নিম্নরূপ :

১. যাকাত
২. ওশর
৩. সাদাকা
৪. করযে হাসান
৫. সদকাতুল ফিতর
৬. ওয়াকফ
৭. ক্যাশ ওয়াকফ
৮. সদকায়ে জারিয়া
৯. ফিদিয়া
১০. ইতআম (খাবার খাওয়ানো)
১১. কাফফারা
১২. হাদিয়া

এগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে এই নিবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে-

১. যাকাত

যাকাত ইসলামে পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। কোরআনের আয়াত ও সুন্নাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামে ইমান ও সালাতের পর অবশ্যপালনীয় কর্তব্যসমূহের মধ্যে যাকাতের স্থান সর্বাগ্রে। যাকাত ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। যাকাত মূলত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া ধনীর সম্পদের গরীবের হক। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন, "তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[১] এখানে তাদের সম্পদ বলতে ধনীদের সম্পদের কথা বলা হয়েছে। রাসূল সা. বলেন : "তাদের ধনীদের নিকট থেকে তা আদায় করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।"[২]

কিন্তু কেন ধনীদের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ থেকে একটি অংশ গ্রহণ করা হবে? পবিত্র কোরআনেই তার জবাব রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করো। এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।"[৩] সাদাকা বা যাকাত গ্রহণ করা হয় ধনীদের সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে। মূলত সকল মানুষ ও তাদের সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ তায়ালা। তাই আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সম্পদকে তার নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে।

এর আরও একটি কারণ সম্পদ যাতে শুধু ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়। কোরআনে এসেছে- "যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের ধনীদের মাঝে বিবর্তিত না হয়।"[৪]

---

১ যারিয়াত : ১৯
২ বুখারী
৩ তাওবা : ১০৩
৪ হাশর : ৭

যাদের নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ এক বছরের বেশি জমা থাকে তাদের উপর যাকাত ফরজ। সম্পদের যে পরিমাণ জমা থাকলে যাকাত দিতে হয় সে পরিমাণকে নিসাব বলে। নিসাবের দুটি মানদণ্ড রয়েছে। ১. সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ বা সমমূল্যের সম্পদ। ২. সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা বা সমমূল্যের সম্পদ।

যার নিকট এ পরিমাণ সম্পদ এক চন্দ্র বছর জমা থাকে তিনি তার সম্পদের ২.৫% যাকাত আদায় করবেন। যাকাত আদায়ের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও প্রশাসনের। তবে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে বেসরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ এ কাজ করতে পারে।

যাকাত যাদেরকে দেয়া যাবে বা যে সকল খাতে ব্যয় করা হবে তা কোরআন মজীদে নির্দেশিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন ফকির-মিসকিন (দরিদ্র), যাকাত আদায়ের কর্মচারি, ইসলামের প্রয়োজনে যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্থতা থেকে মুক্তি, মুসাফির (যিনি ভিনদেশে পাথেয়হারা হয়ে পড়েছেন) এবং আল্লাহর পথে জিহাদ।

যাকাত মূলতঃ সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে এবং দরিদ্র ও বঞ্চিতদের সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়। মুসলিম সমাজ যখনই তাদের অর্থব্যবস্থা যাকাতভিত্তিক করেছে, তখনই আবশ্যিকভাবে তাদের সামগ্রিক অগ্রগতি হয়েছে। খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দারিদ্রের সাথে তাদের পরিচয় ঘুঁচে গেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে যদি পূর্ণভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন করা হয় তবে ১২-১৫ বছরের ব্যবধানে এ দেশে সকল মানুষ স্বনির্ভর হবে।

২. ওশর

ওশর শব্দের অর্থ এক দশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ। ওশর হচ্ছে ফসলের যাকাত। কুরআনুল কারিমে এসেছে- "ওহে মুমিনগণ, তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে যা উৎপন্ন করি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো।"[৫]

প্রাকৃতিক পানিতে উৎপন্ন ফসলের দশভাগের একভাগ যাকাতের খাতে ব্যয় করতে হয়। আর কৃত্রিম উপায়ে সেচের ব্যবস্থা করা হলে সে ফসলে বিশ

৫ বাকারা : ২৬৭

ভাগের এক ভাগ আদায় করতে হয়। একে নিসফু ওশর বলা হয়। নিসফু ওশর মানে ওশরের অর্ধেক। অর্থ্যাৎ সোজা কথায়, প্রাকৃতিক পানিতে উৎপন্ন ফসলের ১/১০ এবং কৃত্রিম সেচে উৎপন্ন ফসলের ১/২০ ভাগ ওশর।

যাকাতের মতো ওশরের ক্ষেত্রে মালিকের কাছে উক্ত ফসলের মালিকানা এক বছর অতিক্রম করা শর্ত নয়। বরং ফসল সংগ্রহের দিন তার ওশর আদায় করতে হয়। কোরআনের ভাষায়- "ফসল সংগ্রহের দিন তার হক (ওশর) আদায় করো।"[৬]

পঁচনশীল নয় এমন সংরক্ষণযোগ্য ফসলে যাকাত আদায় করতে হয়। যদি তা ২৫ মণ মতান্তরে ১৭ মণের বেশি হয়। তবে ইমাম আবু হানিফার মতে, জমিন থেকে যা কিছুই উৎপন্ন হবে (কম হোক বা বেশি) তার ওশর আদায় করতে হবে।

যে ফসল ওজনযোগ্য নয় যেমন তুলা, আখ, পাট ইত্যাদিতে বহুল প্রচলিত ফসলের মূল্যের সাথে সমন্বয় করে নিসাব (ওশরযোগ্য সম্পদের পরিমাণ) নির্ধারণ করতে হবে।

ওশর যাকাতের ৮ টি খাতেই আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে ফসলের পরিবর্তে সম পরিমাণ মূল্য ওশর হিসেবে আদায় করা যাবে।

৩. সাদাকা

কোরআনে যাকাত ও সাদাকা একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ফকিহগণ যাকাতকে ফরয সাদাকা অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা নফল দানের ক্ষেত্রে সাদাকা শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপরই শুধু যাকাত ফরজ হয়। তবে যে কোনো প্রকারের দান ইসলামে খুবই মর্যাদার কাজ। তাই যার সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয়নি তিনিও যেমন দান করেন, তেমনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকও ফরজ পরিমাণের বাইরে দান করে থাকেন।

অতিরিক্ত বা নফল এ দানকে ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাদাকা বলা হয়। পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা বাকারার শুরুতে মুত্তাকীদের গুণ বর্ণনা করে এভাবে পরিচিত করা হয়েছে, "যারা অদৃশ্যের উপর ইমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের রিযিক হিসেবে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"[৭]

৬ আনয়াম : ১৪১
৭ বাকারা : ৩

আয়াতের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, মুমিন/মুত্তাকী যিনি কোরআনকে হিদায়াত হিসেবে নিতে চান তার গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করেন। অন্য আয়াতে এসেছে "তোমরা যা দান করো আল্লাহ তার বিনিময় দেবেন।"[৮] আর আল্লাহ তায়ালার বিনিয়ম সর্বোত্তম বিনিময়।

সাদাকা আমাদের পাপরাশিকে মুছে দেয়। আর তা বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রতিদান হয়ে আল্লাহর দরবারে লিপিবদ্ধ হয়। প্রদানের পর খোঁটা দেয়া বা কষ্ট দেয়া নিকৃষ্ট কাজ। এটা সাদাকাকে বাতিল করে দেয়। পছন্দনীয় সম্পদ সাদাকা করা উত্তম।

৪. করযে হাসানা

করযে হাসানা দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। করয মানে ধার দেয়া। আর হাসান মানে উত্তম। অর্থাৎ করযে হাসানা মানে উত্তম ধার দেয়া। উত্তম ধার কথাটির মানে আমরা সকলেই জানি- কাউকে এই শর্তে কোনো সম্পদ দেয়া যে, সে তা ফেরত দেবে। শরিয়তের পরিভাষায়ও তা প্রায় একই; কাউকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে এমন সম্পদ দেয়া, যা থেকে সে উপকৃত হবে এবং পরে তা ফেরত দেবে।

কাউকে তার প্রয়োজনে কোনো লাভ ব্যতীত ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করার এ পদ্ধতিকে আল্লাহ তায়ালা সাদাকাহ বা দানের উপর প্রাধাণ্য দিয়েছেন। রাসূল সা. বলেন- "আমি মিরাজের রাতে জান্নাতের দরজায় লেখা দেখেছি, সাদাকার প্রতিদান দশগুণ; আর লাভবিহীন ঋণ দানের প্রতিদান আঠারো গুণ। আমি জিবরাইলকে জিজ্ঞাসা করলাম- জিবরাইল! ঋণদানের মাহাত্ম্য কি যে, তা সাদাকার চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ! জিবরাইল বলেন- কারণ অনেকে নিজের কাছে সম্পদ থাকার পরও সাদাকা প্রত্যাশা করেন। কিন্তু ঋণ কেবল তিনিই চান, যার কাছে (প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ সম্পদ) নেই।

পবিত্র কোরআনুল কারিমে অনেক আয়াতে লাভবিহীন ঋণ প্রদান বা করযে হাসানাকে মহীয়ান করে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- "কে সে! যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ (জীবিকা) সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।"[৯]

৮ সাবা : ৩৯
৯ বাকারা : ২৪৫

হাদিসে এসেছে- "যে এই দুনিয়ায় কোনো মুসলিমের একটি বিপদ দূর করে, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে তার একটি বিপদ দূর করেন।"[১০]

করযে হাসানার মাধ্যমে বান্দার দুনিয়ার বিপদ দূর হয়। ফলে আল্লাহ আখেরাতে তার বিপদ দূর করেন।

৫. ওয়াকফ

ওয়াকফ মানে কোনো সম্পদ এ শর্তে দান করা যে, দানকৃত মূল সম্পদ ঠিক বজায় থাকবে এবং তার মুনাফা কল্যাণমূলক কোনো খাতে ব্যয় করা হবে। ইতিহাসে দেখা যায়- মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণে ওয়াকফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শাব্দিকভাবে ওয়াকফ মানে- আটক রাখা বা নিষেধাজ্ঞা দেয়া। আর শরিয়ার পরিভাষায় মূল সম্পদ আটক রেখে বা ঠিক রেখে কোনও নির্দিষ্ট কল্যাণমূলক খাতে সেটির মুনাফা ব্যয় করাই ওয়াকফ। যেমন, কোনো বিল্ডিং বা কৃষি জমি আল্লাহর মালিকানায় রেখে তার ভাড়া বা উৎপাদিত ফসল নির্দিষ্ট কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।

ওয়াকফ করার পর সে সম্পদ আর বিক্রি করা যায় না। কাউকে দানও করা যায় না। উত্তরাধিকার হিসেবেও বন্টন করা যায় না।

ওয়াকফ এক প্রকার সদকায়ে জারিয়া। যে সাদাকার কল্যাণ যুগের পর যুগ ধরে বহমান থাকে তাই সাদাকায়ে জারিয়া। ওয়াকফের ক্ষেত্রে যেহেতু মূল সম্পদ বিদ্যমান থাকে এবং তার কল্যাণ উপকারভোগীরা ভোগ করতে পারে তাই এটা সাদাকায়ে জারিয়ার অংশ।

ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন যুগে মুসলিম ধনশালীরা জীবনের কোনো এক সময়ে নিজ সম্পদের একটি অংশ কল্যাণমূলক খাতে ওয়াকফ করতেন। কোনো মুসলিম অধ্যুষিত শহরে অর্ধেকের বেশি সম্পদ কল্যাণমূলক খাতে ওয়াকফ হয়েছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিতে পিছিয়ে পড়া মুসলিম উম্মাহর বর্তমান সঙ্কট কাটাতে ওয়াকফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১০ মুসলিম

৬. ক্যাশ ওয়াকফ

সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে ওয়াকফ তাত্ত্বিক ও ধরণগত দিক থেকে পূর্বের ধারণার তুলনায় বেশ বিস্তৃত হয়েছে। বিস্তৃত নতুন ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজন হলো ক্যাশ ওয়াকফ। এটা কোনোভাবেই আর স্থাবর ওয়াকফের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ২০০৪ সালে ইসলামিক ফিকহ কাউন্সিল এটাকে স্বীকৃতি দেয়।

ক্যাশ ওয়াকফ বলতে যা বুঝায় তা হলো- নগদ অর্থ কল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ রাখা এবং মূল অর্থ ঠিক রেখে তার মুনাফা উক্তরূপ কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। সাধারণ ওয়াকফের সাথে ক্যাশ ওয়াকফের পার্থক্য হলো এই যে, সাধারণ ওয়াকফ স্থাবর সম্পদকে কেন্দ্র পরিচালিত হয়; আর ক্যাশ ওয়াকফ নগদ অর্থকে অবলম্বন করে পরিচালিত হয়।

২০০৪ সালে ওমানে অনুষ্ঠিত ওআইসি ফিকহ কাউন্সিলের ঘোষণায় বলা হয়, "ক্যাশ ওয়াকফ শরিয়াহসম্মত। কেননা ওয়াকফের শরয়ি মাকসাদ 'মূল ঠিক রেখে মুনাফা ব্যয়' এখানে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়।"

বহমান এ সময়ে ক্যাশ ওয়াকফ এ কারণে অধিক গুরুত্বের দাবিদার হয়েছে যে, এর মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে ও সুবিধাজনক উপায়ে ওয়াকফ সংক্রান্ত কার্যাবলি সমাধান করা সম্ভব। ওয়াকফের বিস্তৃতি ও উন্নতির জন্যও তা সহায়ক। আর সহজেই এর মাধ্যমে ওয়াকফের সুবিধাভোগীদের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের আয়বর্ধক প্রকল্প গড়ে তোলা যায়।

সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এর তারল্য, ওয়াকফকারীদের সম্মিলিত অংশগ্রহণের সুযোগ এবং অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ সহজ হওয়া। আজকের দিনে মানুষের পক্ষে স্থাবর সম্পত্তি বের করে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা করা বেশ কঠিন। তবে অনেকে মিলে একটি উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ দান করলে সহজেই একটি বড় প্রকল্প দাড়িয়ে যায়। ফলে ওয়াকফকারী এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান সকলেই সহজে কার্য সম্পাদন করতে পারেন। এভাবে একজন কম পুঁজির মালিকও ওয়াকফ করতে সক্ষম হন। আর এভাবে ওয়াকফের বিস্তৃতি নতুন মাত্রা পেয়ে বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে।

৭. সদকায়ে জারিয়া

হাদিসে এসেছে- যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমলনামা বন্ধ হয়ে যায়। (অর্থ্যাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে একজন মানুষের নেকী অর্জনের সুযোগ শেষ হয়ে যায়।) তবে তিনটি বিষয় ছাড়া- "সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।" মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও আমলনামায় নেকি লেখা হতে পারে সদকায়ে জারিয়ার মাধ্যমে।

সদকা মানে দান। আর জারিয়া মানে প্রবাহমান। যে দানের ফলাফল চলমান থাকে তাকে সদকায়ে জারিয়া বলে। ইমাম নববি উপরোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- সদকায়ে জারিয়া মানেই ওয়াকফ। ওয়াকফ মানে- মূলধন বজায় রেখে মুনাফা কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করা। এ ধরনের সদাকা থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে। আর দানকারীর আমলনামায় নেকি সংযোজনের ধারা চলমান থাকে।

সদকায়ে জারিয়ার কিছু উদাহরণ দেখা যাক। আমরা যেভাবে সদকায়ে জারিয়া করতে পারি তার মধ্যে অন্যতম বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা। সা'দ ইবনে উবাদা রা. থেকে বর্ণিত- "আমার মায়ের মৃত্যুর পর আমি রাসূল সা.-কে বললাম, আমি কি আমার মায়ের পক্ষ থেকে সদকা করতে পারি? রাসূল সা. এরশাদ করলেন, হ্যাঁ করতে পার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন সদকা উত্তম? রাসূল সা. বলেন, পানি পানের ব্যবস্থা করো।"[১১]

পুকুর, দিঘি, খাল, নলকূপ ইত্যাদি খনন করা, মসজিদ নির্মাণ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানসাধকের সেবা ইত্যাদিও সদকায়ে জারিয়ার মধ্যে পড়ে। গাছ রোপন করা, জনসাধারণের জন্য বাগান নির্মাণ, ছায়ার ব্যবস্থা করা, জনকল্যাণমূলক গবেষণা, গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট, বাজার নির্মাণ ইত্যাদিও সদকায়ে জারিয়ার মধ্যে পড়ে। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সদকায়ে জারিয়া বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন বন্যাপ্রবণ এলাকায় বেড়িবাঁধ নির্মাণ, উপকূলীয় এলাকায় কেওড়া ইত্যাদির বাগান করা, রাতে চলাচলের রাস্তায় বিজলিবাতির ব্যবস্থা করা, নদীমাতৃক এলাকায় খেয়া বা খেয়াঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা সদকায়ে জারিয়ার মধ্যে পড়ে।

---

১১ আবু দাউদ, নাসায়ি

৮. ফিদইয়া

কোরআনের বাণী- "হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে।"[১২]

সাওম বা রোজা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। প্রতিবছর রমজান মাসে সিয়াম সাধনা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। তবে যিনি সফরে থাকেন বা অসুস্থ হন তাকে পরবর্তীকালে তা আদায় করতে হবে। কিন্তু কারও অসুস্থতা যদি এমন হয় যে, তার আর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই; কিংবা তিনি বার্ধক্যের কারণে সাওম পালন করতে সক্ষম নন, তবে তিনি প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবেন।

ফিদিয়া শুধু তিনি দেবেন যিনি ফিদিয়া দানে সক্ষম। যার ফিদিয়া দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তার উপর কোনো কিছু বর্তাবে না। মানুষের সাধ্যের বাইরে কোনো দায় নেই।

ফিদিয়ার পরিমাণ হলো, নিজ পরিবারে মানে একজন ব্যক্তির একদিনের খাবার। ফকীহগণ এটার একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তবে তাদের স্থান-কাল-পাত্র ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়েছে। তাদের কেউ ১ মুদ পরিমাণ, কেউ ১ সা পরিমাণ এবং কেউ অর্ধ সা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। যেহেতু তারা তাদের স্থানীয় ও সমকালীন বাস্তবতায় তা নির্ধারণ করেছেন, তাই আমরা সে আলোচনায় যাচ্ছি না। একজন মানুষকে একদিনের খাবার দিতে হবে বা খাওয়াতে হবে।

সলফে সালেহীনের আমল থেকে দেখা যায়, তারা ৩০ টি সাওমের বিনিময়ে একসাথে ৩০ জন মিসকিনকে একদিনের খাবার প্রদান করতেন। অনেকে সাওম শুরুর আগেই তা প্রদান করতেন। ফিদিয়া খাবার দিয়েই পরিশোধ করতে হবে, ওই খাবারের মূল্য দিয়ে নয়।

১২ বাকারা : ১৮৩-১৮৪

৯. ইতআম (খাবার খাওয়ানো)

রাসূল সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো- ইসলামে কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বলেন, "খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।" বুখারি হাদিসে আরও এসেছে- "তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে খাবার খাওয়ায় এবং সালামের জবাব দেয়।"[১৩]

উপরের দু'টি হাদিস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সর্বোত্তম কাজ খাবার খাওয়ানো এবং তিনি সর্বোত্তম লোক যিনি খাবার খাওয়ান। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের জীবন যাপনের প্রধান উপকরণ হচ্ছে খাদ্য ও পানীয়। আল্লাহর সৃষ্টি মানুষকে খাবার খাওয়ানোকে আল্লাহ তায়ালা ইবাদাত ও উত্তম চরিত্র হিসেবে গণ্য করেন। বিশেষত ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের সময় খাবার খাওয়ানোকে কোরআনে মহান গুণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে- "অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান।"[১৪] আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীল লোকদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : "তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।"[১৫]

খাবার খাওয়ানো মহৎ কাজ। এটা আমরা কোরআন ও হাদিস থেকে জানলাম। কিন্তু কাদেরকে খাবার খাওয়াতে হবে? উপরের আয়াতে মিসকিন, ইয়াতিম ও বন্দিকে খাবার খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে। আর যাদের খাবার খাওয়ানোর কথা বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে এসেছে- দরিদ্র, অসুস্থ লোক, মুসাফির, বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি, মেহমান, প্রতিবেশী, কর্মচারি/চাকর, ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্থ, সাহায্যপ্রার্থী।

খাবার খাওয়ানো নবি-রাসূল ও সলফে সালিহিনের চরিত্র ও গুণ। আল্লাহ আমাদের রিযিকদাতা। খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে পারি। আর গবীরকে হারাম খাবারের দিকে ঠেলে দেয়া এবং ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা নিরেট শয়তানের ধোকা। "শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায়।" খাবার খাওয়ানোর গুরুত্ব এতো বেশি যে বিভিন্ন ইবাদাতে কমতির কারণে ওয়াজিব হওয়া ফিদিয়া ও কাফফারায়ও খাবার খাওয়ানোকে যুক্ত করা হয়েছে। তবে লোকদেখানোর জন্য খাবার খাওয়ানো পাপকাজ হিসেবে গণ্য।

১৩ বুখারি, মুসলিম
১৪ বালাদ : ১৪
১৫ ইনসান/দাহর : ৮

১০. কাফফারা

অপরাধ থেকে মাফ পাওয়ার জন্য শরিয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিই কাফফারা। চারটি অপরাধের জন্য শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয় কাফফারা হিসেবে। সেগুলো হলো- হত্যা, যিহার, রমজানের রোজা ও শপথ ভঙ্গ করা।

ভুলবশত হত্যার কাফফারা : "কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে সেটা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একজন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় করা কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যে সঙ্গতিহীন সে ধারাবাহিকভাবে দু' মাস সিয়াম পালন করবে।

শপথ ভঙ্গের কাফফারা : রাসূল সা. বলেন- কোন ব্যাপারে যদি শপথ কর আর ভিন্ন কিছুর মাঝে কল্যাণ দেখতে পাও, তবে নিজ শপথের কাফফারা আদায় করে উত্তমটি গ্রহণ কর। আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, "শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করো; তারপর ভাল কাজটি কর।" কাফফারা হিসেবে নিচের তিনটির কোনো একটি আদায় করতে হবে- দশজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো; দশজন মিসকীনকে বস্ত্র দান করা; একজন ঈমানদার ক্রীতদাস আদায করা।

রোজা ভঙ্গের কাফফারা : রোজা ভঙ্গের কাফফারা তিনভাবে আদায় করা যায়। একজন দাস মুক্ত করা; ধারাবাহিকভাবে ৬০টি রোজা পালন করা বা ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা তৃপ্তিসহকারে খাওয়ানো।

যিহারের কাফফারা : যিহার হলো স্ত্রীর কোনো অঙ্গকে মাহরাম কারও অঙ্গের সাথে তুলনা করা। যিহারের কাফফারা হলো একটি গোলাম আযাদ করা বা টানা দুই মাস সিয়াম পালন করবে অথবা ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।

১১. হাদিয়া

হাদিয়া মানে উপহার। কাউকে বিনিময় ছাড়া কোনো উপহার দেয়া। অন্যান্য দানে সাধারণত দরিদ্র, অভাবী বা বিপদে পড়া লোককে করা হয়। কিন্তু উপহার বা হাদিয়া যে কাউকে দেয়া যায়। রাসূল সা. বলেন- "তোমরা হাদিয়া দাও। তোমাদের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।"

ফিকহের পরিভাষায়- জীবিত অবস্থায় বিনিময় ছাড়া কাউকে কোনোকিছু দান করাকে হাদিয়া বলা হয়।

কাউকে কোনোকিছু হাদিয়া দেয়ার পর তিনি সেটার মালিক হয়ে যান। তিনি তা ব্যবহার করতে পারেন বা অন্য কোনো কাজে লাগাতে পারেন।

হাদিয়ার ক্ষেত্রে ইসলামে কিছু আদব অনুসরণ করার নির্দেশনা রয়েছে-

- নিকটজনদের দিয়ে হাদিয়া প্রদান শুরু করা।
- হাদিয়া স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করে দেয়া; বিরূপ প্রভাব যাতে না পড়ে।
- সন্তানদের হাদিয়া দিলে সমমানের দেয়া।
- হাদিয়া ফিরিয়ে না নেয়া। "যে উপহার ফেরত নেয়, সে যেন বমি পান করে।"
- হাদিয়া ফেরত নিতে হলে কারণ বর্ণনা করা।
- বিনা কারণে উত্তম হাদিয়া ফেরত না দেয়া।
- হাদিয়া দানকারীকে সময়-সুযোগ দেখে হাদিয়া করা।
- হাদিয়ার বিনিময়ে কোনো সুবিধা না নেয়া।

হাদিয়ার বিনিময়ে কোনো সুবিধা নেয়া হলে তা আর হাদিয়া থাকে না। তা উৎকোচে পরিণত হয়। আর উৎকোচ ইসলামে নিকৃষ্ট জিনিস।

দাওয়াতি কাজের উত্তম মাধ্যম হাদিয়া প্রদান। হাদিয়া হৃদয়কে আকৃষ্ট করে নেয়। সলফে সালেহিনরা কাউকে দ্বীনের পথে আকৃষ্ট করার জন্য হাদিয়া প্রদান করতেন।

১২. সদকাতুল ফিতর

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে যে সাদাকাহ আদায় করা হয় তাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়। এ সাদাকা ঈদুল ফিতরের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় একে সাদাকাতুল ফিতর বলা হয়।

প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা‘ পরিমাণ আদায় করা ওয়াজিব করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সালাত বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।”

সওমের ভুল ভ্রান্তি থেকে মাফ পাওয়া এবং ঈদের দিনে গরীব লোকজন যাতে অনাহারে না থেকে ঈদের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে, তাই সদাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অভিবাবক তার পরিবারের সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করবেন।

ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশনা আছে। তবে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় এক/দুইদিন আগে আদায় করা উত্তম মনে হলে, তাই করা ভালো। হাদিসে খাবারের মাধ্যমে সাদকাতুল ফিতর আদায়ের কথা উল্লেখ থাকলেও মুজতাহিদ অনেক আলেম তার মূল্য পরিশোধ করাটায় দাতা ও গ্রহিতার জন্য সহজ ও কল্যাণ বলে মত দিয়েছেন।

বাস্তবিকভাবে একজন মানুষের দুইবেলা মধ্যম মানের খাবারের মূল্যের পরিমাণই সদকাতুল ফিতর। কেউ যদি নির্দিষ্ট সময়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার মতো গ্রহিতা না পেয়ে থাকেন তবে তিনি পরবর্তীতে তা আদায় করে দেবেন। দরিদ্র ব্যক্তিও চাইলে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারেন। বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হাদিসের বর্ণনা অনুসারে প্রতি বছর সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন।

ফিতরা প্রদান করার খাত হচ্ছে- ফকির ও মিসকীন। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের আগে তা আদায় করবে তা কবুলযোগ্য ফিতরা হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পর আদায় করবে সেটা সাধারণ সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স

ইসলামি সামাজিক অর্থায়নের বিভিন্ন দিককে পরিচিত, বিকশিত ও সম্প্রসারণে কাজ করে ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সোশ্যাল ফাইনান্স (IISF)।

ভিশন : ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত ও অভাবমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক-সহমর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠা।

মিশন : ইসলামি সামাজিক অর্থায়নের বিকাশ, সম্প্রসারণ ও অনুসরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সমাজের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ইসলামি সামাজিক অর্থায়নের খাতগুলোকে সমাজের সকল পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ, প্রসার ও বাস্তবায়ন করা।

কর্মসূচি :

- গবেষণা
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- দাওয়াহ ও উদ্বুদ্ধকরণ
- পঠনসামগ্রী প্রণয়ন ও প্রকাশনা